Vol. 58 | No. 3 | 2023

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শহীদুল জহিরের ছোটগল্প: নিম্নবর্গের অনুশীলন

Volume	58
Issue	3
Year	2023
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Md. Angur Hossain
Published online	June 1, 2023
DOI	10.62328/sp.v58i3.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v58i3.10
Pages	১৫৯-১৮১
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

শহীদুল জহিরের ছোটগল্প: নিম্নবর্গের অনুশীলন

Check for updates

মোঃ আঙ্গুর হোসেন

সাহিত্য পত্রিকা

Shahitto Potrika
eISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 58
Number 3

সাহিত্য পত্রিকা (২০২৩) ৫৮ (৩): ১৫৯-১৮১
DOI 10.62328/sp.v58i3.10

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শহীদুল জহিরের ছোটগল্প: নিম্নবর্গের অনুশীলন

মোঃ আঙ্গুর হোসেন*

সার-সংক্ষেপ: আশির দশকে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের অঙ্গনে খ্যাতিমান লেখক শহীদুল জহির; যাঁর ছোটগল্পে দৃশ্যমান হয়েছে সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি, তাদের আচার-আচরণ ও চিন্তা-ভাবনা। এর পাশাপাশি সমাজের উচ্চবর্গের মানুষের সাথে নিম্নবর্গের মানুষের সম্পর্কের দোলাচলও উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সময়ে সবচেয়ে বেশি সামাজিকভাবে অবহেলিত হয়েছে নিম্নশ্রেণির মানুষ। তাঁর গল্পে সমাজের এ নিম্নশ্রেণির মানুষের বেদনার্ত হাহাকার, নিদারুণ কান্না ও অসহায়ত্ব যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি উঠে এসেছে স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশের সামাজিক সংকট ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। আর এসবের মুখোমুখি হয়েছে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ; বিশেষত সমাজের প্রান্তিক মানুষ। শহীদুল জহিরের *পারাপার* (১৯৮৫), *ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প* (১৯৯৯) এবং *ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প* (২০০৪) গ্রন্থের গল্পসমূহে ফুটে উঠেছে সামাজিক এসব বৈষম্যের বিবিধ চিত্র। আলোচ্য গল্পগুলোর মধ্যে সমাজের উচ্চশ্রেণি দ্বারা নিম্নশ্রেণির অত্যাচারেরে বা শোষণের চিত্র এ প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে; যেখানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রচিত গল্পগুলোতে বিপুলভাবে 'নিম্নবর্গ' তত্ত্বের প্রভাব বিদ্যমান। আলোচ্য প্রবন্ধে সমাজের নিম্নবর্গের জীবনযাপন-পদ্ধতি, তাদের আচার-আচরণ ও ভাবাদর্শের দিকগুলো 'সাব-অল্টার্ন' বা 'নিম্নবর্গ' তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি।

১

বিশ্বসাহিত্যের ছোটগল্পের ন্যায় বাংলা ছোটগল্পও আজ বেশ সমৃদ্ধ। এর পেছনে বিদ্যমান রয়েছে বিষয়গত বৈচিত্র্য ও আঙ্গিকগত নান্দনিকতা। যাঁদের সাধনা, শ্রম ও প্রয়াসে এ ধারা বিশ্বজনীন মর্যাদার আসন লাভ করেছে তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিখ্যাত গল্পকারদের মতো বাংলাদেশেও ষাট, সত্তর ও আশির দশকে কালজয়ী গল্প-চর্চা করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) ও শহীদুল জহির (১৯৫৩-২০০৮) প্রমুখ। এরমধ্যে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যাঙ্গনে, বিশেষ করে গল্প-ভুবনে কথাকার শহীদুল জহিরের অনুসন্ধিৎসু পদচারণা ও সফলতম অবদানে মিলেছে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়। যিনি নিভৃতে চেষ্টা করেছেন সমাজের নানা স্তরের মানুষকে ভিন্নভাবে অবলোকন করার। খুব সচেতনভাবে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়লে দেখা যায় সেসব চিত্র। বিশেষ করে সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের আশা-স্বপ্ন-বাস্তবতা, জীবনযাপন-পদ্ধতি ও

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোণা

গভীরতর জীবনভাবনা উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। সেখানে প্রমূর্ত হয়েছে সমাজের উচ্চবর্গের মানুষের সাথে নিম্নবর্গের সম্পর্কের দোলাচাল ও দ্বন্দ্ব। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সময়ে সবচেয়ে বেশি সামাজিকভাবে হেয় ও অবহেলিত হয়েছে এ নিম্নশ্রেণির মানুষ। তাঁর ছোটগল্পে উঠে এসেছে সমাজের এ শ্রেণির অন্তহীন হাহাকার ও নিদারুণ কান্নার কথা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী এ সামাজিক বৈষম্য আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে এবং কার্যত এর প্রধান ভুক্তভোগী হয়েছে সমাজের এসব মানুষ। এ বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> আদি গল্পরচনার কাল ১৯৭৪ এবং অন্তিম গল্পরচনার কাল ২০০৩। এই ত্রিশবছরে ব্যাপ্ত ১৮টি গল্পের পর তিনি কত পরিণত হয়েছেন সেটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। ১৯৭৪ সালে রচিত 'ভালোবাসা' এবং ২০০৩ সালে প্রণীত 'ডলু নদীর হাওয়া'র মধ্যে অনেক ব্যবধান। আবার তার তাবৎ গল্প থেকে শহীদুল জহিরের একটি চরিত্রই উদ্ভাসিত হয়, সমাজের অন্তেবাসী মানুষের জীবন-যাপনের চিত্রণই তার লক্ষ্য। বহিজীবনই অনেকখানি, তারই মধ্য দিয়ে অন্তর্লোকে যাত্রা। এ বহির্জীবনের পটভূমি বাংলাদেশ, শুধু ঢাকা শহর নয় – ঢাকার বাইরেরও কোনো কোনো স্থান নির্বাচন করে নিয়েছেন এবং গভীর সত্যতা ও নিবিষ্টতার সঙ্গে তার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। (আবদুল মান্নান, ২০১১: ২৭০-২৭১)

অনেকের মতে, শহীদুল জহির মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রতিনিধি। তবে এতে কোনো সন্দেহ আছে বলে মনে হয় না। অন্যদিকে তাঁর রচনায় নিম্নবর্গের চেতনাও এসেছে। এর কারণ, তিনি মাও সেতুং (১৮৯৩-১৯৭৬)-এর সাহিত্য ও ডাক্তার নরম্যান বেথুন (১৮৯০-১৯৩৯)-এর জীবনী দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন। এ কারণে কলেজ থেকেই তাঁর মধ্যে মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। পরিবর্তীকালে সরকারি চাকরিসূত্রে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হতে তাঁকে দেখা যায়নি। এজন্য ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর মধ্যে যে চেতনা ছিল, তার আলোকে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের সংগ্রামের চিত্র উঠে এসেছে তাঁর গল্পে; যা তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *পারাপার* (১৯৮৫)-এ দৃশ্যমান। এ সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য:

> পারাপার গ্রন্থের শিল্পান্বেষায় মার্কসবাদী চিন্তার চমৎকার স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। এই গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পেই মার্কসীয় শ্রেণিচেতনাস্নাত লেখকের কলমে বিধৃত হয়েছে প্রান্তিক মানুষের জীবনের বহুকৌণিক দিক। *পারাপার* গ্রন্থের পাঁচটি গল্পের সবগুলোতেই নিম্নবর্গের সংগ্রামী জীবনকে গভীর মমতায় বিধৃত করেছেন তিনি। (লোকমান, ২০২১: ৮৭)

তাঁর ছোটগল্পে বিষয় ভাবনায় রয়েছে বিবিধ আবহ। এ কারণে একদিকে যেমন তাঁর গল্পকে 'উত্তর-কাঠামোবাদী' সাহিত্যাদর্শ দিয়ে বিচার করা যায়, অন্যদিকে তেমনি তাঁর রচনাকে আরো নানাভাবে আলোচনা করার সুযোগ তৈরি হয়। যেমন: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, নর-নারীর প্রেমভাবনা, পুরনো ঢাকার চালচিত্র ইত্যাদি। ঢাকার বাস্তবতা, ঢাকার স্থানীয় ভাষা ও জীবনযাপন পদ্ধতির পাশাপাশি নাগরিক জীবনের নানা প্রসঙ্গও এসব গল্পে এসেছে। এসব মানুষের স্বপ্ন, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, জীবনের কঠিন বাস্তবতা, মানুষের টিকে থাকার সংগ্রামের চিত্র রয়েছে এখানে। তাঁর ছোটগল্পের বিষয়গত দিক নিয়ে যেমন কাজ হয়েছে,

তেমনি রূপ ও আঙ্গিক নিয়েও হয়েছে বিস্তর গবেষণা। তাঁর গল্পের বড় একটা জায়গায় আছে জাদুবাস্তবতা। যেখানে বাস্তবের জগতে থেকেও অবাস্তবের বা অতিবাস্তবের একটি জগৎ তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকার অন্যতম বিখ্যাত লেখক ও ঔপন্যাসিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর রচনায় জাদুবাস্তবতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। তবে তাঁর ছোটগল্পে নিম্নশ্রেণির মানুষের ভাবনা, উচ্চবর্গের সাথে নিম্নবর্গের সম্পর্কের টানাপড়েনসহ নির্মম বাস্তবতা বিদ্যমান; যা 'নিম্নবর্গ' তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ রয়েছে।

২

কোনো বিশেষ দেশ বা অঞ্চলের বিশেষত অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক বলয় ইত্যাদি প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তি করেই সূচনা ঘটেছে এক একটি তত্ত্বীয় ধারণার। তবে সময়ের চিরায়ত ক্রমবিবর্তনে বা পরিবর্তনশীলতার অনিবার্য নিয়মের শৃঙ্খলা দ্বারা চিরস্থায়ীভাবে এসব তত্ত্বকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। যেহেতু এসব তত্ত্ব কোনো একটা সময় অবশ্যই পরিবর্তনশীল, সেহেতু এই তত্ত্ব দ্বারা কোনো দেশের, সমাজের বা মানবজীবনের সামগ্রিকতাকে নিয়ে ব্যাখ্যা করা অনেকটা জটিল এবং ক্ষেত্রবিশেষে দুরূহও বটে। আর তখনই প্রয়োজন হয় অন্য আরেকটি তত্ত্বের। উদ্ভাবিত এ নতুন তত্ত্বের দ্বারা পুরনো তত্ত্বকে যে অস্বীকার করা হয় তা নয়, বরং পুরনো বা আগের তত্ত্বকে অনেকটা স্বীকার করে, এর প্রাসঙ্গিক অংশ গ্রহণ করে, সে-তত্ত্বকে সংস্কার বা সম্প্রসারণ করে নতুন আরো একটি তত্ত্ব দাঁড় করানো হয়; যা হয়ে ওঠে পূর্বের তত্ত্ব থেকে অধিকতর ভিন্ন, অভিনব ও নতুন ধাঁচের।

একটা সময় ভারতীয় উপমহাদেশে উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণের মুখের ও লিখিত ভাষা ছিল সংস্কৃত। আর এ ভাষায় সমাজের নিচের স্তরের সাধারণ মানুষের পূর্ণ অধিকার ও পারঙ্গমতা ছিল না। রামায়ণে বর্ণিত আছে সমাজের এই নিচের শ্রেণিকে উচ্চশ্রেণির মানুষের ভাষার অধিকার পেতে সংগ্রাম করতে হয়েছে। অনেক সময় এ কারণে তাদের প্রাণহানিও ঘটেছে। যেমন: মধ্যযুগের রামদাস, নানক, কবীর, দাদূ, নাভা তাদের জীবন-ইতিহাস পর্যালোচনা ও অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট হয় যে, ভারতীয় উপমহাদেশে কিছু মানুষ ওই উচ্চশ্রেণির মানুষের সংস্কৃত ভাষার বিরোধিতা করে আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছে। বিশেষ করে ভারতের ইতিহাসে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত দার্শনিক রামানুজ থেকে মধ্যযুগের বাংলার শ্রীচৈতন্যদেব তাঁরা উভয়েই উচ্চশ্রেণির মানুষ হয়েও নিম্নবর্গের মানুষ ও তাদের জীবন-পদ্ধতির ধারা নিয়ে কাজ করেছেন; যে নীতি পরবর্তীকালে অনেকের মধ্যে অনুসৃত হয়েছে আমাদের উপমহাদেশের ইতিহাস চর্চা হয়েছে আর্যদের দৃষ্টিভঙ্গিজাত জায়গা থেকে। তবে আর্যদের আগমনের পূর্বে (খ্রি.পূ. ১৫০০ অব্দে) এদেশের অধিবাসীদের জীবন ছিল অরণ্যসংকুল। তাদের জীবন-পদ্ধতি, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, ধর্মবিশ্বাস, লোকায়ত বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা, সামাজিক রীতিনীতির অনেক কিছু গোপনীয়, রহস্যময় ও অজানা রয়ে যায়; যার স্বরূপ অনুসন্ধান করা পুনরায় সম্ভব হয়নি। যারা ছিল মূল ভারতবর্ষের আদিবাসী, সেই অনার্য সভ্যতার বা জাতির জীবন-ইতিহাস অনেকটাই অনুদ্‌ঘাটিত।

আর আর্যজাতি তাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য অনার্য জাতির সকল আচার-আচরণ, জীবনযাপন প্রণালি, অভ্যাস সবকিছুকেই অসভ্য ও বর্বর আখ্যা দেয়; এ কারণে তারা পরবর্তীকালে নিম্নবর্গের মানুষ নামে পরিচিতি লাভ করে।

'নিম্নবর্গ' ইংরেজি 'সাব-অল্টার্ন' শব্দের বাংলা পরিভাষা। সাব-অল্টার্ন তত্ত্বের মধ্য দিয়ে নির্ণীত ও বিচার্য হয় উচ্চবর্গের সাথে নিম্নবর্গের সম্পর্কের নানা মাত্রা। এর মধ্যে অন্যতম ক্ষমতা কাঠামোর সম্পর্ক। অন্যদিকে 'নিম্নবর্গ' একটি বিশেষ ধারণা; যার সঙ্গে ইতিহাসও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ, ইতিহাসের পুনর্বিচার, ব্যাখ্যা ও জ্ঞানের সঙ্গে এর সম্পর্ক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে নতুনভাবে সেই ইতিহাসের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। বিশ শতকের সত্তরের দশক নিম্নবর্গের ইতিহাসের সূচনার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসময় ভারতীয় উপমহাদেশে মার্কসবাদী চেতনার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি নিয়ে নানা অভিমত প্রচলিত ছিল; যা নিয়ে ওইসব বুদ্ধিজীবীর মধ্যে নানা বিতর্ক ও সমালোচনার ঝড় ওঠে। অর্থনীতিবিদদের মতে, ব্রিটিশ উপনিবেশের শেষের দিকে ভারতীয় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় একটি আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তাদের দাবি, এর প্রভাবে ভারতীয় পণ্যের জন্য বিশ্বব্যাপী বড় বাজার সৃষ্টি হয়। আবার এর সঙ্গে অর্থলগ্নী উৎপাদন ব্যবস্থা জড়িয়ে যাওয়ার কারণে এ অঞ্চলের ছোট-বড় বাজারের ওপর পুঁজিবাদী উৎপাদন রীতির নিয়মকে পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। তবে অন্যরা তাদের এ মতের সঙ্গে একমত পোষণ করতে পারেনি। তাদের বক্তব্য হলো, ব্রিটিশদের প্রভাবে ভারতের কোনো কোনো এলাকায় আংশিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এ কথা সত্য; কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহৎ অংশে তখনো আধা সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। যদিও পুঁজিবাদী লক্ষ্মী বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থার কিছুটা সংলগ্নতা রয়েছে, তথাপি এদেশীয় প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাবে খুব বেশি মৌলিক পরিবর্তন বা রূপান্তর সংগঠিত হয়নি। এদের পাশাপাশি উনিশ শতকের নবজাগরণের ব্যাখ্যা নিয়ে কিছু ঐতিহাসিক এগিয়ে আসেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রণজিৎ গুহ (১৯২৩-২০২৩), সুমিত সরকার (১৯৩৯), পার্থ চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৭-) প্রমুখ।

ভারতের এই ইতিহাসবিদদের নজরে আসে কৃষক সংগ্রাম যা ভারতীয় উপমহাদেশের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে বড় ভূমিকা পালন করেছে। কৃষকদের আন্দোলনের মধ্যে প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজনৈতিক সত্তানুসন্ধান, রাষ্ট্রকাঠামোর স্বরূপ ও ক্ষমতা কাঠামো। আর এর সূত্রধরেই ভারতীয় ঐতিহাসিকরা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষমতা কাঠামো সম্পর্কে নতুন চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন। সাধারণত ভারতবর্ষের যে ইতিহাস, তাকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় যথা: উচ্চবর্গের ইতিহাস ও নিম্নবর্গের ইতিহাস। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রচলিত ঔপনিবেশিক ইতিহাসকে উচ্চবর্গ তথা আধিপত্যকামী ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চিন্তার ধারক মনে করা হয়। অন্যদিকে ভারতের ঐতিহাসিকরা এসব উচ্চবর্গের আধিপত্যকামী মানসিকতার ওপর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। উচ্চবর্গীয় ইতিহাসের বিরোধিতা করা তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। আর তারা এ চর্চার নাম দেন নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা।

ইতিহাসকে অভিনব, নতুন ও ভিন্নভাবে দেখানোর ও ব্যাখ্যার প্রয়োজনের কারণেই যেহেতু 'নিম্নবর্গ' তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে, সেহেতু ভারতের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এই 'সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ' এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ভূমিকা রয়েছে। রণজিৎ গুহ 'নিম্নবর্গ' সম্পর্কে *Concise Oxford Dictionary*-র সূত্রে যে মন্তব্য করেছেন তা এমন:

> The Word subaltern in the title stands for the meaning as given in the Concise *Oxford* Dictionary, that is, of inferior rank. It will be used in these pages as a name for the general attribute of subordination in southasian society whether this is expressed in terms of class, caste, age, gender and office or in any other way. (রণজিৎ, ১৯৮২: ৭)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮২ সালে রণজিৎ গুহ ইতিহাস বিভাগে বাংলায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। এসময় থেকেই বিভিন্ন বাংলা পত্রপত্রিকায় 'সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ'-এর বিশ্লেষণ পদ্ধতির সঙ্গে মার্কসীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির মধ্যে তুলনা, সামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা শুরু হয়েছে আর এটাই মূলত 'সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ' বা 'নিম্নবর্গ' তত্ত্বের প্রথম দিকের সূচনার ইতিহাস।

৩

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রসারণের ফলে, তাদের প্রণীত ইউরোপীয় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও জ্ঞানচর্চার কারণে উপনিবেশিত অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে একদিকে যেমন মানসিকতার আমূল পরিবর্তন হয়েছে, অন্যদিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব। এই প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এসব অঞ্চলে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে তা হলো উত্তর-উপনিবেশবাদ। এডওয়ার্ড সাঈদের *ওরিয়েন্টালিজম*, ফানোর *ব্লাক স্কিন হোয়াইট মাস্ক ও রেচেড অব দি আর্থ* হলো এ আন্দোলনের সূচনার দিকের রচনা। এরপরে অন্য তাত্ত্বিকরা নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গা, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিবাক, হোমি কে ভাবা, রবার্ট জে সি ইয়ুঙ, বিল এ্যাশক্রফট প্রমুখ এ আন্দোলনে প্রভূত অবদান রেখেছেন। রণজিৎ গুহের সম্পাদিত গ্রন্থের নাম *Subaltern Studies* (1982-1989)। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার 'নিম্নবর্গ' নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে 'নিম্নবর্গ' শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ:

> Subaltern (নিম্নবর্গ): ইংরেজি ভাষায় শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে। কাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদের 'সাবলটার্ন' বলা হয়। তবে শব্দটির সাধারণ অর্থ হল অধস্তন বা নিম্নস্থিত। আরিস্ততেলীয় ন্যায়শাস্ত্রে এর এমন একটি প্রতিজ্ঞা যা অন্য কোনও প্রতিজ্ঞার অধীন, যা বিশিষ্ট, মূর্ত, সার্বিক নয়। সাধারণ অর্থে ইংরেজিতে এর সমার্থক হল 'সাবর্ডিনেট'। (পার্থ, ১৯৯৮: ২)

সাধারণ অর্থে পদমর্যাদার নিচু বা সাধারণ স্তরের মানুষ, সামাজিক ও পেশাগত অবস্থানে গৌণ, পদ, পদবি, চাকরি, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ইত্যাদি বিবেচনায় যারা নিচে থাকে তাদেরকে নিম্নবর্গ বলা হয়। অন্য অর্থে কর্তৃত্বহীন, দুর্বল বা ক্ষমতাহীন, নিম্নশ্রেণি, সাধারণশ্রেণি,

রুচিহীন, বর্বর, অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত, নিরক্ষর, অস্পৃশ্য, ব্রাত্য, প্রান্তিক কৃষক, খেতমজুর, দাস, অনার্য, আদিবাসী, শোষিত, প্রলেতারিয়েত, অধস্তন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ধারককে নিম্নবর্গের লোক বলে মনে করা হয়। তবে নিম্নবর্গ তত্ত্বের ধারণা আন্তোনিও গ্রামশির *Selections from the Prison Notebooks*-এর মধ্যে রয়েছে। 'সাব-অল্টার্ন'-এর সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয় 'subordinate'. আর আন্তোনিও গ্রামশির রচনা থেকে 'নিম্নবর্গ' ধারণাটি নেওয়া হয়েছে। আন্তোনিও গ্রামশির ওই গ্রন্থের 'On Italian History Classics in Politics' 'History of the Subaltern Classes: Methodological Criteria' অংশে যে ছয়টি বিষয়ের নির্দেশনা রয়েছে তাঁর মধ্যে রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গশ্রেণির জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ ও ভাবাদর্শের প্রয়োজনীয়তা ও সংলগ্নতার কথা স্বীকার করেছেন। তাই বলা যায় 'নিম্নবর্গ'-এর মূল উৎস গ্রামশির রচনা হতে উদ্ভূত হয়েছে। যেমন- গ্রামশির মন্তব্য থেকে তা স্পষ্ট হয়েছে:

> The subaltern classes, by definition, are not unified and cannot unite until they are able to become a "State'': their history, therefore, is intertwined with that of civil society, and thereby with the history of States and groups of States. Hence it is necessary to study: I. the objective formation of the subaltern social groups, by the developments and transformations occurring in the sphere of economic production; their quantitative diffusion and their origins in pre-existing social groups, whose mentality, ideology and aims they conserve for a time: 2. their active or passive affiliation to the dominant political formations, their attempts to influence the programmes of these formations in order to press claims of their own, and the consequences of these attempts in determining processes of decomposition, renovation or neo-formation; 3. the birth of new parties of the dominant groups, intended to conserve the assent of the subaltern groups and to maintain control over them; 4, the formations which the subaltern groups. themselves produce, in order to press claims of a limited and partial character. 5. those new formations which assert the autonomy of the subaltern groups, but within the old framework; 6. those formations which assert the integral. autonomy, ...etc. (Antonio, 1971: 202)

'সাব-অল্টার্ন'-এর লেখকরা দক্ষিণ এশিয়ার সমাজের অধীনতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে এবং এর শ্রেণি, জাতিগত সম্প্রদায়, বয়স, লিঙ্গ ও কর্মস্থল ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেছেন। এই তত্ত্বে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে ঔপনিবেশিককালের ভারতবর্ষের বৃহত্তর গ্রামীণ সমাজের সামাজিক অধীনতাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। রণজিৎ গুহ সামাজিক এ অধীনতা গ্রামশির ধারণা থেকে নিয়েছেন। 'নিম্নবর্গ' তত্ত্বে আন্তোনী গ্রামসি dominant classes, dominance, dominant groups, subordination I hegemony শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। যেখানে আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। কারণ এখানে ব্যবহৃত 'dominance' এর অর্থ 'আধিপত্য' ও 'subordination'-এর অর্থ 'অধীনতা'। নিম্নবর্গ ও উচ্চবর্গের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বা সম্পর্ক হলো ক্ষমতার সম্পর্ক। আর এখানে বলা হয় নিম্নবর্গ সর্বদা শাসকশ্রেণির অধীনে থাকবে। আর তাদের বিদ্রোহ

ও জেগে ওঠার চিত্রও শাসকবর্গের অধীনে পরিচালিত হয়। আধিপত্য বলতে মূলত এলিট বা সমাজের উচ্চবর্গের ক্ষমতা, প্রভুত্ব, প্রতাপ বা শাসনকে বোঝায়। আর যারা তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে বা উচ্চবর্গের অধীন, শোষিত, দলিত, নিপীড়িত এসব জনগণ 'নিম্নবর্গ' নামে পরিচিত। গ্রামশি দুইটি অর্থে 'সাব-অল্টার্ন' (ইতালীয়তে সুবলতের্নো) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। একটি 'প্রলেটারিয়ার্ট' এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণি'কে 'সাবটার্নশ্রেণি' বলা হয়। আর সামাজিক ক্ষমতার বিশেষ গঠন ও বিন্যাসের কারণে এই 'শ্রমিকশ্রেণি' একদিকে যেমন শাসিত হয়, অন্যদিকে তাঁরা শোষিতও হয়। তবে এই বিন্যাসে শ্রমিকশ্রেণি হলো সাব-অল্টার্ন, অন্যদিকে এর বিপরীত হলো 'হেজেমনিকশ্রেণি' বা পুঁজিমালিক 'বুর্জোয়াসি'। এখানে গ্রামশি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছেন সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির ওপর, যেখানে শাসনকাঠামো এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে 'বুর্জোয়াশ্রেণি' তাঁদের প্রভুত্ব যেমন একদিকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, অন্যদিকে 'হেজেমনিক' বা সামাজিক কর্তৃত্ব সৃষ্টি করতে থাকে। আর তাঁরা শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, শক্তি বা কর্তৃত্ব অবলম্বন করেই ক্ষান্ত হয় না, এরা সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন এনে হেজেমনিক বা বুর্জোয়াশ্রেণি সাব-অল্টার্নশ্রেণি বা শ্রমিকশ্রেণির নিকট হতে তাঁদের সামাজিক সম্মতি আদায় করতেও সক্ষম হয়। নিম্নবর্গ সম্পর্কে গ্রামশির নিকট থেকে প্রাথমিক ধারণা নিলেও পরবর্তীকালের তাত্ত্বিকদের মধ্যে মৌলিক ও স্বকীয় চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। রণজিৎ গুহের মন্তব্যে তা বোঝা যায়:

> গ্রামশি থেকে শেখার তাড়না সত্ত্বেও, আমরা সামগ্রিকভাবে আমাদের নিজস্ব ভিত্তির উপর দাঁড়ানো ছিলাম।... প্রতিক্ষেত্রেই গ্রামশির শিক্ষা ব্যাপকভাবে আমাদের সহায়ক হয়। এক্ষেত্রে আমরা ভারতের সমাজ ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতেই গ্রামশির তত্ত্বকে যতটা সম্ভব কাজে লাগিয়েছি। ইতালি তথা পাশ্চাত্ত্য সমাজের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কিছু সমাজে একে অনুসরণ করা হচ্ছে। (রণজিৎ, ২০১২: ১৯২-২০০)

অন্যদিকে মূলত ক্ষমতা ও প্রতিরোধের মিথস্ক্রিয়ার কথা মিশেল ফুকোর প্রতাপ তত্ত্বে রয়েছে। আর এ ধারণায় ক্ষমতা সামাজিক স্তর বিন্যাসের সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। বিশেষ করে পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শাসক ও শোষিতের মধ্যে এবং প্রশাসনেও এ ক্ষমতা বিদ্যমান। নিম্নবর্গের লেখকরা মনে করেন সমাজের প্রতিটা মানুষ এ ক্ষমতা ব্যবহার করে, আবার এ ক্ষমতার অধীনে তারা নিয়ন্ত্রিতও হয়। নিম্নবর্গের তাত্ত্বিকরা সমাজের মধ্যকার এই ক্ষমতার গতিবিধি ও প্রয়োগ নিয়ে কাজ করেছেন। তারা মনে করেন যে, গ্রামশির নিকট হতে নিম্নবর্গের তাত্ত্বিকরা আধিপত্য ও অধীনতার ধারণা নিয়েছেন। আবার ফুকোর নিকট হতে ক্ষমতা কাঠামোও নিয়েছেন। আর সে ক্ষমতা স্থির নয়। আর এ কারণে যেখানে ক্ষমতা আছে, সেখানে প্রতিরোধ ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে। তবে এ প্রতিরোধ সংঘবদ্ধভাবে হয় না, ব্যক্তিক পর্যায়ে হয়ে থাকে বলে ফুকো মনে করেন। তাই যেখানে ক্ষমতা বিস্তর লাভ করবে সেখানে অবশ্যই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এ বিষয়ে মিশেল ফুকো বলেন:

> Myself, I am not sure, when I began to interest myself in this problem of power, of having spoken very clearly about it or used the words needed. Now I have a much clearer idea of all that. It seems to me that we mustdistinguish the relationships of power as strategic games between liberties strategic games that result in the fact that some people try to determinethe conduct of others and the states of domination, which are what weordinarily call power. And, between the two, between the games of powerand the states of domination, you have governmental technologies-giving this term a very wide meaning for it is also the way in which you governyour wife, your children as well as the way you govern an institution. Theanalysis of these techniques is necessary, because it is often through thiskind of technique that states of domination are established and maintainthemselves. In my analysis of power, there are three levels: the strategicrelationships, the techniques of government, and the levels of domination. (Simon, 1992: 128)

৪

নিম্নবর্গের মধ্যে স্বভাবতই প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী চেতনা থাকে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত রীতিতে নিম্নবর্গকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। তাদেরকে নিষ্ক্রিয়, দুর্বল, ভীরু ও একান্ত অনুগত হিসেবে গণ্য করা হয়। নিম্নবর্গের রাজনৈতিক মতাদর্শ হলো সমাজের উচ্চবর্গের প্রতি প্রবলভাবে আনুগত্য প্রদর্শন ও বিরোধিতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। নিম্নবর্গের প্রতিদিনের জীবনাভিজ্ঞতা থেকে যে পরাধীনতা ও অধীনতার সূচনা হয়, তা থেকেই মূলত সূত্রপাত হয়েছে নিম্নবর্গের বিরোধী মনোভাব। শোষণ-বঞ্চনা, অত্যাচার- অনাচার, বিরহ-যন্ত্রণা থেকেই এ শ্রেণির মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে প্রচণ্ড ক্ষোভ। সমাজের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, কর্মহীনতা, ঋণগ্রস্ততা, জমি হারানো, দুর্ভিক্ষ, স্বল্প মজুরি, মহাজনি ঋণের বোঝা ইত্যাদি কারণে এ শ্রেণির মানুষ অস্তিত্ববোধের প্রকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হয়। তাদের এ অধীনতার চৈতন্য কোনোভাবেই বড় ধরনের প্রতিরোধ-স্পৃহা গড়ে তুলতে পারে না। বরং তাদের মধ্যে দেখা দেয় পরনির্ভরতা ও সহযোগিতা অন্বেষার মনোভাব। তবে উচ্চবর্গের দ্বারা অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত কিংবা নিপীড়িত নিম্নবর্গের মানুষের নীরবে নিভৃতে থাকা কান্নাও কখনো কখনো প্রতিবাদ হয়ে ওঠে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে: 'শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রভুত্বের অধিকারী উচ্চবর্গের চেতনা মৌলিক, সমগ্র, সক্রিয়। অন্যদিকে নিম্নবর্গের চেতনা খণ্ডিত, নির্জীব, পরাধীন।' (পার্থ, ১৯৯৯: ৪)

শহীদুল জহিরের, 'ভালোবাসা' (পারাপার)[১] গল্পে আবেদা এবং 'মাটি ও মানুষের রং' গল্পে আম্বিয়াকে প্রতিবাদী হিসেবে দেখা যায়। দুই নারী চরিত্রের মধ্যে ভিন্ন সুরে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। তারা নিরুপায় হয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবাদ করেছে। 'ভালোবাসা' (১৯৭৪) গল্পটিতে উল্লেখিত হয়েছে নিম্নবর্গের জীবনযাপন পদ্ধতি। বিশেষত বস্তিবাসীর জীবনের স্বপ্ন ও প্রত্যাশার একটি বাস্তব অনুষঙ্গ নিয়ে রচিত এ গল্পটি। অনেক সময় দরিদ্র্য ও সমাজের নিম্নশ্রেণিতে অবস্থান করার কারণে তাদের জীবনের নানা আশা ও স্বপ্ন পূরণ হয় না। মনের ইচ্ছা প্রবল থাকার পরও অনেক সময় তার পূর্ণতা দান সম্ভব হয় না। এ গল্পে শহীদুল জহির খুব সচেতনভাবে সমাজের এ শ্রেণির মানুষের জীবনের এমন

একটি দিক সামনে আনতে চেষ্টা করেছেন। হাফিজদ্দির স্ত্রী (আবেদা) অন্যের বাসায় কাজ করে দরিদ্র সংসারে সাহায্য করে। কারণ পরিবারে চরম দারিদ্র্য বিরাজমান থাকায় এক জনের উপার্জন দিয়ে ভালোভাবে সংসার চলে না। তাদের (নিম্নবর্গের) সংসারের এমন অভাব-অনটনের চিত্র একটি বাক্যে স্পষ্ট হয়েছে:

> ভাত? পাইলি কই? তুই খাস নাই? না। আমি বিবিসাহেবের অইহান খন খায়া আছি। মিথ্যে বলে আবেদা। স্বামীর কাছে মিথ্যে বলা এ তার নতুন নয়। হাফিজদ্দি রাজি হয়ে যায়। বলে, তহুরা কই গেছে, দেহি না যে? (শহীদুল, ২০১৯: ১২)

হাফিজদ্দি স্ত্রী (আবেদা) ও মেয়েকে (তহুরা) নিয়ে বস্তিজীবন অতিবাহিত করতে হয়। শহিদ দিবস থেকে সংগৃহীত একটি ডালিয়া ফুলকে কেন্দ্র করে আবেদার মনে স্বামীর কাছ থেকে প্রণয়াবেগ ও ভালোবাসা পাবার প্রত্যাশা জেগে ওঠে। মনে মনে ভাবে স্বামী মনে হয় তাকে এই ফুলটি উপহার দেওয়ার জন্য নিয়ে এসেছে। কিন্তু তার মনে জেগে ওঠা এমন আবেগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ফুলটি একটি বোতলে পানির মধ্যে রেখে হাফিজদ্দি চলে যায় কিন্তু আবেদাকে ফুলটি উপহার হিসেবে দেয়নি। স্বামীর অনুপস্থিতিতে ডালিয়া ফুলটি আবেদা নিজের খোঁপায় পরে। স্বামী বাড়িতে আসলে বিষয়টি জানাজানি হলে আবেদা মিথ্যা কথা বলে। এখানে দেখা যায় যে, দারিদ্র্য কখনো কখনো মানুষের সুপ্ত আবেগকেও পর্যন্ত কেড়ে নিতে পারে। এখানে হাফিজদ্দির নিয়ে আসা সামান্য একটি ডালিয়া ফুল আবেদার মধ্যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে; যা পরোক্ষভাবে হাফিজদ্দির আধিপত্যমূলক মনোভাব লালন করাকে বোঝায়। অন্যদিকে স্বামীর এ আধিপত্যের নিকট আবেদার যে অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছে, তার মধ্যে অধীনতাশ্রেণির ইঙ্গিত অনুমেয় ও পরিদৃশ্যমান। যেমন: গল্পে আবেদাকে ডালিয়া ফুলটি খোপায় গোপনে পরতে হয়। আবার স্বামীর নিকট তা জানাজানির পরে তাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। আবেদার কথায় ফুটে ওঠে স্বামীর প্রতি অধীনতার সেই দিকটি। 'আবেদা বোঝে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু স্বীকার করে নিতেও ওর কেমন অস্বস্তি লাগে। বলে, দুপুরে চুল ঝাড়নের সময় হয়তো চুল পড়েছিল ফুলের উপরে!' (শহীদুল, ২০১৯: ১৪)

'মাটি ও মানুষের রং' (১৯৭৬) গল্পে সমাজের দারিদ্র্য ও নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনের করুণ আর্তি ও প্রতিবাদের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে টিকে থাকার জন্য মানুষের নিরন্তর সংগ্রামের চিত্র দেখানো হয়েছে। শুধু অর্থনৈতিক মানদণ্ডের মাধ্যমে সমাজে বিভাজন তৈরি হয় এমন না, কখনো কখনো মানুষের দৈহিক রঙের কারণেও মানুষের মধ্যে বৈষম্য দেখা যায়। যার সঙ্গে সামাজিক কুসংস্কারও অনেকাংশে বিদ্যমান থাকে। এ গল্পে মানুষের গায়ের রং বা বর্ণ-বৈষম্যের দিকটি প্রধান করে দেখানো হয়েছে। আমাদের সমাজে এখনো যুক্তিহীন, ভিত্তিহিন, বিজ্ঞানে আস্থাহীন মানুষের সংখ্যা কোনো অংশে কম নয়। আবার আমাদের দেশে একটা কথা বিশেষভাবে প্রচলিত যে, বিয়ের ক্ষেত্রে গায়ের রংকে অনেকেই প্রাধান্য দেয়। গল্পে তিনটি পরিবারের (আফতাব খাঁ, দবির খাঁ, নইমুল্লাহর পরিবার) মধ্যে এ বিষয়টি শহীদুল জহির দেখিয়েছেন। খাদের ভিটায় আফতাব খাঁ ও দবির খাঁ দুই পরিবারের মধ্যে নইমুল্লাহ তাদের গোত্রের কেউ নয়।

অন্য জায়গা থেকে এসে একত্রে এখানে বসবাস করে। অর্থনৈতিক বিচারে আফতাব খাঁর পরিবার তুলনামূলকভাবে নিম্নবিত্ত হলেও এখানে প্রধান হিসেবে বিবেচিত, অন্যদিকে নইমুল্লাহ সবচেয়ে গরিব প্রকৃতির। তবুও এদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য বিদ্যমান; যা পরবর্তীকালে তাঁদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনকেও ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের সামাজিক এই বিভাজন গল্পকারের ভাষায়:

> এটা খা দের ভিটা। ভিটায়, এই ডাঙ্গায় তিনটি বাড়ি। আফতাব খাঁ, দবির খাঁ আর আম্বির বাপ নইমুল্লাহ। নইমুল্লাহ, খাঁ নয়। লোকে ধরে এ ভিটায় দু শরিকের বাস। আফতাব খাঁ আর দবির খাঁ। আম্বির বাপ নইমুল্লাহকে কেউ গোনে না। সে এক কোণে চুপচাপ পুষ্যিদের নিয়ে বাস করে যাচ্ছে। আফতাব খাঁ এখানে মাথা। নইমুল্লাহ এখানে সবচাইতে গরিব এবং সে খাঁদের কেউ নয়। (শহীদুল, ২০১৯: ৩৪)

এ গল্পে নিম্নবর্গের শ্রেণি বৈষম্যের পাশাপাশি নিম্নবর্গের উত্থানের প্রসঙ্গও রয়েছে। তার মেয়ের (আম্বিয়া) সাথে দূরের গ্রামের দরিদ্র খেতমজুর জোবেদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাই (ছাবেদ) ও মা (শ্রীতন্নেছা)-কে নিয়ে অভাবের সংসার অতিবাহিত করতে হয় জোবেদকে। আম্বিয়ার শাশুড়ি তাকে খুব ভালবাসে। আম্বিয়ার কোলে প্রায় সাত মাসের একটি ফুটফুটে ফর্সা ছেলে। আম্বিয়া ও জোবেদের গায়ের রং কালো হলেও তাদের সন্তান সুন্দর ও ফর্সা। আম্বিয়ার গায়ের রং বংশানুক্রমিকভাবে কালো হলেও তার স্বামীর গায়ের রং বংশানুক্রমিকভাবে কালো নয়। প্রচণ্ড রোদে (ফসলের জমিতে) কাজ করার কারণে তার শরীর প্রথমে বাদামি, তারপরে কালো রং ধারণ করেছে। সংসারে তীব্রভাবে অভাব-অনটন বিদ্যমান থাকায় আম্বিয়াকে বিয়ের পর প্রায়ই বাপের বাড়ি যেতে হয়। অন্যদিকে দবির খাঁর স্ত্রীর নাম আসিয়া খাতুনের তিন সন্তানের মধ্যে প্রথম সন্তান মালেক। মালেক ও তার মা (আসিয়া খাতুন) সহ ওই পরিবারের সকলের গায়ের রং কালো। আসিয়া খাতুন চেয়েছে মনেপ্রাণে এই কালো রঙের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে। সেজন্য সে নিজের বড় সন্তানকে (মালেক) ফর্সা মেয়ে ময়নার সঙ্গে বিয়ে দেয়। যাতে তার পরবর্তী বংশধর আর কালো না হয়। আসিয়া নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য মনে মনে আম্বিয়াকে পছন্দ করতো বিয়ের আগে থেকেই। কিন্তু নিজের মধ্য থাকা বর্ণ-বিদ্বেষের জন্য আম্বিয়ার সঙ্গে বিয়ে দেয়নি। অবশ্য আসিয়া খাতুন তার মনের যে ইচ্ছা নিয়ে ময়নার সঙ্গে মালেকের বিয়ে দেয়, সে আশা তার পূরণ হয়নি। তাঁদের নাতি ফজু ওরফে ফয়েজউদ্দিন দেখতে কালো হয়েছে। আসিয়া খাতুনের চিন্তা-ভাবনার বিপরীতে এখানে আম্বিয়ার মধ্যদিয়ে নিম্নবর্গের উত্থান দেখানো হয়েছে। গল্পে হারুর মাকে আম্বিয়ার হয়ে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। আম্বিয়ার স্বামী কালো নয়, সে কঠোর পরিশ্রম করে রোদে পুড়ে কালো হয়েছে। কিন্তু আসিয়া যখন আম্বিয়ার এমন সন্তান জন্মদানে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করে অভিযোগ করে তখন আম্বিয়া প্রতিবাদ করে। আম্বিয়া শান্ত প্রকৃতির ছিল। চাচির সঙ্গে এমন আচরণ কোনোদিন সে করেনি। পরিস্থিতি তাকে এমন আচরণ করতে বাধ্য করে।

> আম্বির গলার স্বর চিরায়তভাবে মসৃণ, বুকের ভেতরটা চকিত ঘূর্ণির তাণ্ডবে সচকিত। শুকনো এবং নিচু গলায় কথা বলে সে, দেকবাইন চাচি, রোইদে কেমুন ক্ষেত জ্বইলা

> জ্বইলা কালা অয়। খেতের উপরে মানুষ জ্বলে কালা কয়লার লান। সারা শরীর খালি, শুধু কুমরে কাছা দেওন লুঙ্গি। আম্বির এত কথা বলা স্বভাব নয়। সে এখানে থামতে পারত, কিন্তু থামে না, মগজের ভেতর থেকে প্রজ্বলিত আগুনের জিহবা বেরিয়ে আসে। বলে, আমার সোয়ামির কুমোরের লুঙ্গি খুইললা দিলে বুজার পারবেন আমনেরও এইরম পোলা অইতো পারে। আমারে ছিলান হওন লাগে নাই সুন্দর পোলার লাইগগা । (শহীদুল, ২০১৯: ৩৯)

৫

আধিপত্যশীল শ্রেণি ও অধীন শ্রেণির দ্বন্দ্ব নিম্নবর্গের অন্যতম প্রধান আলোচনার বিষয়। 'তোরাব সেখ' (১৯৭৫) গল্পে বস্তিবাসীর জীবনে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তারের কাঠামোতেও বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের মধ্যেও যে অর্থ মাঝে মাঝে অনেক বড় পরিবর্তনের নিয়ামক হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ গল্পটি। এ গল্পে বাবা-ছেলের মধ্যকার ক্ষমতা ও পরিবার নিয়ন্ত্রণের দ্বন্দ্বের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশের সামাজিক রীতি ও পারিবারিক প্রচলিত নীতিতে ছেলেকে বাবার আনুগত্য মেনে চলা স্বাভাবিক ব্যাপার। বাবাই সংসার বা পরিবারের সকলের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে পরিবারে পুরো কর্তৃত্ব করে। কিন্তু এ গল্পে দেখা যায় তার বিপরীতধর্মী চিত্র। এ গল্পে বাবা বয়সোচিত অসমর্থতাহেতু ও দুর্বলতার কারণে সংসারে অর্থনৈতিক অবদান রাখতে পারে না। যে কারণে ছেলের নিকট চলে আসে পরিবারের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব। আর তখন বাবার সিদ্ধান্ত ও মতামতকে কোনো প্রকার গুরুত্ব দেয় না সন্তান। বৃদ্ধ তোরাব সেখ, সহধর্মিণী (রহিমা), ছেলে (জমির), ছেলে-বউ (লতিফা), যুবতী কন্যা (লালবানু)-কে নিয়ে তারা বস্তির একটি ঝুপড়িতে বসবাস করে। ঝুঁপড়ির বরাদ্দ তোরাব সেখের নামে। কিন্তু তার ভাড়া বহন করতে হয় ছেলেকে (জমির)। আর এ কারণে জমির বাবার কোনো কথা শুনতে চায় না। এমনকি বাবার প্রতি তার কোনো সম্মানবোধও এ গল্পে দেখা যায়নি। পরিবারের কর্তৃত্ব বা আধিপত্য সন্তানের হাতে। অন্যদিকে তোরাব সেখ সন্তানের অধীনতা মেনে নিতে পারে না। আর পারিবারিক ক্ষমতা বা আধিপত্যের এ রূপান্তরধর্মিতা ও পরিবর্তনশীলতা তোরাব সেখের অন্তর্দহনকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। তোরাব সেখের শারীরিক অক্ষমতা তার মনের মধ্যে এক ধরনের দহন সৃষ্টি করে। গল্পকার তার মনোজগৎ উন্মোচন করেছেন এভাবে:

> তাহলে জেদি ঘোড়ার মতোই ওর শরীরটাকে খাটিয়ে পুরুষ করতে পারত। কিন্তু ও পুরুষ নয়, বুড়ো। পুরুষ মানুষেরই প্রত্যেক দিন কাজ জোটে না, বুড়োদের জুটবে কোত্থেকে! (শহীদুল, ২০১৯: ১৮)

তোরাব সেখের নিজের পরিবারের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি চলে যায় মেয়ে লালবানুর বিয়েকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ঘটনায়। লালবানু নিজের পছন্দে মজিদ মিয়ার সঙ্গে বিয়েতে রাজি হয়। শুধু সে যে রাজি হয় তা নয়, তার ছেলে জমিরও মজিদ মিয়ার খারাপ স্বভাব জানার পরেও বোনের বিয়েতে রাজি হয়। তোরাব সেখকে বিষয়টি জানালে সে মজিদ মিয়ার সঙ্গে মেয়ের

বিয়েতে মত দেয় না। কিন্তু জমির তার বাবার এ মতকে অগ্রাহ্য করে। ক্ষেত্রবিশেষ সেবাবাকে বারংবার অশ্রদ্ধা করে। সুতরাং এখানে পরিবারের নিয়ন্ত্রণ আর বাবার নিকট থাকে না। সন্তানের মতামতও সেখানে গুরুত্ব পায়। সন্তান বাবার ক্ষমতার ওপর আধিপত্য বিস্তার করায় প্রচলিত সামাজিক রীতির মধ্যে আধিপত্যশীল শ্রেণি ও অধীন শ্রেণির দ্বন্দ্ব পরিদৃশ্যমান হয়েছে; যা নিম্নবর্গের তত্ত্বের মূল নীতিকে সমর্থন করে। আর সে কারণে বাবা (তোরাব সেখ) সন্তানের (জমির) অধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। যেমন:

> তোরাব চুপ করে বসে থাকে। হৃদপিণ্ডটা লাফাতে থাকে। ও ভেবে পায় না লালবানুটা কী দেখল লোকটার ভেতর। কী দেখে অমন ডাকাতের মতো দোজবরটাকে বিয়ে করতে চায়। নিজেকে বড় অসহায় লাগে। (শহীদুল, ২০১৯: ২০)

সুতরাং তোরাব সেখ পরিবারের আধিপত্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। পরিবারের আধিপত্য তার সন্তানের হাতে চলে যায়। মেয়ে লালবানুও বাবার নিষেধ অমান্য করে মজিদের সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করে। এ ব্যাপারটা তোরাব সেখের নিকট মোটেও ভালো লাগে না। অন্যদিকে জমিরের কাছ থেকে এমন একটি কথা সে শোনে, যা তার মনোলোকে তীব্র আঘাতের সৃষ্টি করে। তোরাব সেখ জমিরকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বললে জমির তা অগ্রাহ্য করে: 'যামু না, বলে জমির। এই ঝুপড়ি তোমার নামে এলুট, আর ভাড়া দেয় এই জমিরা। তোমার খারাপ লাগলে তুমি যাও গা।' (শহীদুল, ২০১৯: ২১) অতঃপর তোরাব সেখ নিজের প্রতি অভিমান করে সন্তানের নিকট অধীনতা মেনে না নিয়ে সংসার থেকে দূরে চলে যায়।

'পারাপার' (১৯৭৫) গল্পে অসাধারণভাবে সমাজের আধিপত্যশীল শ্রেণির সাথে অধীন শ্রেণির দ্বন্দ্বের বিষয়টি এসেছে। নিম্নবর্গের জীবন-সংগ্রামের বাস্তবতার পাশাপাশি সমাজের নিম্নশ্রেণির প্রতি অবহেলা ও নির্যাতনের চিত্র রয়েছে এ গল্পে। সমাজের এ শ্রেণির মানুষ নিজেদের ক্ষমতা ও আধিপত্যের মাধ্যমে অন্যকে অসম্মান যেমন করে, তেমনি নির্যাতন করতেও পিছপা হয় না। এ গল্পের মধ্যদিয়ে সমকালীন নিম্নশ্রেণির প্রতি উচ্চশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দৃশ্যমান হয়েছে। যেমন:

> উচ্চবর্গের দ্বারা লাঞ্ছিত অত্যাচারিত নিপীড়িত নিম্নবর্গের মানুষের জীবন প্রতিকার বা প্রতিবাদহীন হয়ে সবসময় চলে না। ভদ্র সমাজ তাদের বেয়াদবি কিংবা মাথা উঁচু করে চলা মেনে নিতে না পারলেও নিঃশেষিত হয় না তারা। নীরবে নিভৃতে তাদের কান্না কখোনো প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। প্রতিরোধ জানান দেয় গোয়ার্তুমির মাধ্যমেও। (মিল্টন, ২০০৯: ২৮০-২৮১)

রেলের টিকিট চেকারের চাকরির জন্য চট্টগ্রামে যাওয়াকে কেন্দ্র করে পাবনা ফেরার পথে জগন্নাথগঞ্জে ইস্টিমার পার হওয়ার সময় সরকারের এক জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে ওলির পরিচয় ঘটে। ওই ঘাটে দুই জন কিশোর কুলি বসির ও আবুলের সঙ্গে তার দেখা হয়। তারা উভয়েই অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে এ কাজে এসেছে। তাদের ঘাটে কুলিগিরি করার কোনো লাইসেন্স না থাকায় সংগ্রাম করে এ কাজ করতে হয়েছে। তারা দুজনেই

নিম্নবর্গের শ্রেণিভুক্ত। আবুলের বাবার মৃত্যু ও মায়ের পুনর্বার বিবাহের কারণে খাবারের জন্য বাধ্য হয়ে কুলির কাজ করতে হয়েছে। অন্যদিকে বসিরের বাবার বৃদ্ধকালীন অবস্থা, বোনের দ্বিতীয় বার বিয়ে ও স্বামী কর্তৃক বোনের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি ইত্যাদি কারণে বসিরকেও জীবিকার তাগিদে এ কাজ করতে হয়েছে। এ বয়সের কিশোররা স্কুলে যায়। কিন্তু নিম্নবর্গের অস্তিত্বের নির্মম বাস্তবতা ও চরম দরিদ্রতার নিকট পরাজিত হয়েই এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছে তারা। ওলির প্রশ্নোত্তরে রয়েছে তাদের (নিম্নবর্গের) করুণ অনুভূতি। যেমন:

> আমি একা থাকি। বলল আবুল। বশিরের বাপ থাকে আর বুইন থাকে। ওর বাপ ছার বুড়া হয়া গেছে। ভালোমতো কাম কইরবার পারে না। ওর বুইনের ছার দুইবার বিয়া হইছিল। কোনো জামাই-ই খাইবার দিব্যার পাইরত না। এখন হোটেলের কাম করে। (শহীদুল, ২০১৯: ২৬)

নিম্নবর্গের ওপর শোষণের চিত্রও রয়েছে এ গল্পে। সরকারের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার দ্বারা সমাজের নিম্নশ্রেণিভুক্ত কুলি আবুল ও বসিরের ওপর আধিপত্যারোপ, কর্তৃত্বারোপ, নির্যাতন, অবহেলা এবং হেয় আচরণের প্রসঙ্গ রয়েছে। সরকারি ক্ষমতাবলে অসহায় কুলিদের ওপর কর্তৃত্বারোপ ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে অবজ্ঞা ও টাকার বিনিময়ে জোরপূর্বক বেডিং বহন ইত্যাদি করানো হয়েছে। আবুল কর্তৃক যমুনা নদীতে অসাবধানতাবশত বেডিং ফেলে দেওয়ায় তাকে নির্যাতন করা হয়েছে। তাছাড়া ওলিকে অকারণ সন্দেহ ও হেয় করার পাশাপাশি আধিপত্য ও ক্ষমতার কাছে ওলির মতো শিক্ষিত মানুষকেও পরাজিত এবং অসহায় হতে হয়েছে। উচ্চবর্গ কর্তৃক নিম্নবর্গের ওপর এমন নির্যাতনের চিত্র দেখা যায় আবুলের ওপর চড়াও হওয়া এবং ওলির ওপর নির্যাতনকে কেন্দ্র করে; যেখানে উচ্চবর্গের শোষণমূলক ও আধিপত্যনির্ভর মনোভাব দৃশ্যমান হয়েছে। যেমন:

> সে এগিয়ে এসে অত্যন্ত ভদ্র এবং নিস্পৃহভাবে ওলির শার্টের আস্তিন ধরল। ওলি নিজেকে আয়ত্তে আনতে চাইল প্রাণপণে, ভেতরের কাপুনির গলা টিপে ধরতে চাইল। ধুলো উড়ছিল, গরম লাগছিল, ওলি ঘামতে লাগল ...। গলাটা শুকিয়ে গেল, ঢোক গিলে সে বলল, শার্ট ছাড়েন। লোকটা ছাড়ল না, ওয়েট! (শহীদুল, ২০১৯: ৩১)

মাঝে মাঝে আধিপত্যের নিকট সমাজের অন্য শ্রেণির লোকেরা ভয়ে চুপ থাকে। কখনো কখনো সেই অবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়। আবার অনেক সময় এসব মানুষ হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। সরকারি ওই কর্মকর্তার ব্যবহার ওলির মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। তাই সে অন্য কোনো পথ না পেয়ে হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। আবুলও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিবাদ করে দৌড়ে পালায়। সুতরাং সমাজের অধীন শ্রেণির লোকেরা সবসময় আধিপত্যশীল শ্রেণির অত্যাচার-নির্যাতন মেনে নেয় না, তারা বাধ্য হয়ে অনেক সময় প্রতিবাদও করে নিরুপায় হয়ে। এ গল্পে সেই অবস্থা দেখানো হয়েছে। যেমন:

> ওলির ডান হাতের মুঠটা লোকটার চোয়াল স্পর্শ করল। ছিটকে পড়ে গেল লোকটা। প্রায় একই সঙ্গে নিজেকে ঝাঁকি দিয়ে মুক্ত করে নিল আবুল, দৌড় দিল ফ্লাট পার

> হয়ে স্টিমারের পেছন দিকে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যমুনার কালো ঘোলা পানিতে। (শহীদুল, ২০১৯: ৩১)

আধিপত্যশ্রেণির শোষণের চিত্র 'ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে' (১৯৭৬) গল্পেও যেমন আছে, তেমনি রয়েছে সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের অসহায় কান্না ও সামাজিক বাস্তবতা। প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের জীবনের পাশাপাশি সমাজের প্রধান (মাথা) ব্যক্তিদের জোরপূর্বক যুক্তিহীন মতবাদ প্রচারের বিষয়ও এতে রয়েছে। এ গল্পে একটু অন্যভাবে নিম্নশ্রেণির অবস্থা অঙ্কন করা হয়েছে। অসহায় শ্রেণি সামাজিকভাবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগুলো বেছে নেয়, তা অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। এই শ্রেণির মানুষ বারবার উত্থানের চেষ্টা করেছে। কিন্তু সবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে তাদের প্রচেষ্টা। অন্যদিকে আধিপত্যকামীরা ক্ষমতাকে ব্যবহার করে অসহায় মানুষের ওপর নির্যাতন ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। আনন্দপাল লেনের বাসিন্দাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ছোট ছোট ঘটনায় তা দৃশ্যমান। আনন্দপাল লেনের একটি মন্দিরের পুরোহিত নেপাল চন্দ্রের ভাড়া ঘরে বাস করে আলফাজুদ্দিন আহম্মদ। সে সন্তানকে (রফিক) নিয়ে একটি অতি ক্ষুদ্র ঘরে থাকে। আনছার উদ্দিনের ছেলে আলফাজুদ্দিন আহম্মদকে সবাই নবাব বলে ডাকে। একটা সময় নবাব তার স্ত্রী জরিনার সঙ্গে বস্তিতে থাকত। নবাব বস্তি ত্যাগ করে এসেছে আনন্দপাল লেনে। তার বাবা আনছার উদ্দিনও অত্যন্ত গরিব ছিল। সে ইউনুছ মিয়ার (ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান) গরুর রাখালি করত। তাই সে (নবাব) মনের মধ্যে এই দারিদ্র্য অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বারবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সফল হয়নি। বরং আধিপত্যকামী মানুষের দ্বারা অন্যায় অবিচারের শিকার হয়েছে ।

প্রবল বৃষ্টিতে স্বামীবাগের পুরান রেললাইনের বস্তির একটি ভিখিরি শিশু সন্তান নিয়ে নবাবের ঘরে আশ্রয় নিলে এরশাদ মিয়া ক্ষমতা ও আধিপত্যের চর্চা শুরু করে। আশ্রিতা ওই ভিখিরির স্বামী ও সন্তান রয়েছে। নবাবের আশ্রয় দেওয়াটাকে খারাপ ও অবৈধ সম্পর্ক মনে করে শাস্তিস্বরূপ তার সঙ্গে ভিখিরির বিয়ের আয়োজন করা হয়। সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি ও আধিপত্যের নিকট নবাব মিথ্যা অপবাদ মেনে নিতে এবং ওই ভিখিরিকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। নবাব সমাজের (আনন্দপাল লেনের) অধীন শ্রেণির একজন হওয়ায় তাকে যুক্তিহীন, বিচারহীন, অন্যায় ও সামাজিক অপবাদের মখোমুখি হতে হয়। এ অবস্থায় নবাবের ভাবনালোকে নিম্নবর্গের করুণ অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। যথা:

> নবাব ভাবে। সত্যি ভাবে। ও পুঁটলির মতো মেয়েটাকে দেখে। রফিককে দেখে। একটা দীর্ঘশ্বাস ঠেলে ওঠে। এভাবে হয় না। মনের কোথাও যেন জানা ছিল, হবে না। অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিশ্বাস স্থাপন করে বসেছিল সে, যদি হয়ে যায়, যদি নৌকো পার হয়ে যায় কোনোরকমে সমাজ-সংস্কারের খরস্রোতে ডুবিডুবি করেও। কিন্তু তা হয় না, নৌকো ডুবেই যায়। জরিনাকে মনে পড়ে নবাবের। ও বলে, আপনারা একটু বাইরে যান। (শহীদুল, ২০১৯: ৫২)

বাজার অর্থনীতির বিচারে উৎপাদক বিক্রেতাকে আধিপত্যশীল শ্রেণি ও ক্রেতাসাধারণকে অধীন শ্রেণি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ নীতিতে বিক্রেতা

শোষক (আধিপত্যশীল শ্রেণি), ক্রেতা শোষিত (অধীন শ্রেণি) হিসেবে গণ্য। এমন ভাব 'ডুমুরখেকো মানুষ' (১৯৯২)[২] গল্পের গভীরে বিদ্যমান রয়েছে। ভিন্নধর্মী গল্পে আধিপত্য ও অধীন শ্রেণির মানদণ্ডকে বাজার অর্থনীতির নিরিখে দেখানো হয়েছে। মানুষের চাহিদার সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির উৎপাদক বা বিক্রেতাশ্রেণি গড়ে উঠেছে। যারা পুরো একচেটিয়াভাবে বাজার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মোহাব্বত আলীর ব্যবসায়িক নীতির সাথে আধিপত্য বিস্তারের সম্পর্ককে দেখা যেতে পারে। সে বুদ্ধি ও কৌশলকে ব্যবহার করে নিজের পণ্যের অতিরঞ্জিত বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে ভোক্তা শ্রেণিকে তার পণ্য কিনতে বাধ্য করছে। তার বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে ভোক্তারা তার পণ্যের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত হওয়ায় বেশি দামে পণ্য কিনতে বাধ্য হয়েছে। পণ্যের গুণগত মান অপেক্ষা তাকে অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করে ভোক্তাদের (অধীন শ্রেণি) হাতে রাখতে সর্বদা তৎপর এর। এ গল্পেও সেরকম মনোভাব রয়েছে মোহাব্বত আলীর মধ্যে। সে ফলের মধ্যে অত্যন্ত কম পরিচিত একটি ফল ডুমুর ব্যবহার করে ব্যবসায়িক নীতি চরিতার্থ করছে। পুরান ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কে আগত দর্শক প্রতীকী অর্থে মোহাব্বত আলীর পণ্যের ক্রেতা। তারা বিজ্ঞাপন দ্বারা সম্মোহিত। গল্পে বিক্রেতা জাদুকর মোহাব্বত আলী দুই টাকার ডুমুর সময়ের ব্যবধানে চৌষট্টি টাকায় বিক্রি করেছে। ক্রেতাদের এমনভাবে আসক্ত করেছে যে, তারা পুরো ডুমুর গাছটাই কিনতে চেয়েছে।

তবে এমনভাবে ভোক্তাদের ওপর আধিপত্য বজায় রাখলে এর পরিণতি সবসময় ভালো হয় না। মাঝে মাঝে এমন একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণের কারণে ভোক্তাশ্রেণিও বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। অনেক সময় এর কারণে বিক্রেতাদেরও (উৎপাদকের) পরিণতি খারাপ হতে পারে। সেরকম মনোভাব এ গল্পে প্রতীকী অর্থে প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে ডুমুর বিক্রেতার ওপর পাঁচ আসক্ত ক্রেতা নিরুপায় হয়ে তাকে মেরে ফেলেছে এবং তারাও মারা গিয়েছে। সুতরাং শহীদুল জহির বাজার অর্থনীতির মধ্যেও উৎপাদক বা বিক্রেতার সঙ্গে ক্রেতার সম্পর্কের মধ্যে এই বিশ্বায়নের যুগে আধিপত্যশীল শ্রেণি ও অধীন শ্রেণির সম্পর্ক লক্ষ করেছেন। যেখানে অধীন শ্রেণির বিদ্রোহ ও এমন সম্পর্কের খারাপ পরিণতি উভয়ের জন্য কল্যাণকর নয় বরং অধিকতর অমঙ্গলকর। স্বপ্ন, বিভ্রম, পরাবাস্তব ও জাদু-বাস্তবতার মধ্যদিয়ে চমৎকারভাবে সেটা দেখিয়েছেন।

উচ্চবিত্তদের সহায়তায় মাস্তানদের সাহায্যে আধিপত্য বিস্তার ও অসহায়শ্রেণির প্রতি অন্যায়-অবিচারের প্রসঙ্গ রয়েছে 'এই সময়' (১৯৯৩) গল্পে। শহীদুল জহির '৯০-এর দশকের সমাজের অবক্ষয়িত রূপটিকে দেখিয়েছেন। যেখানে উচ্চবিত্তদের অর্থনৈতিক সাহায্য ও সহযোগিতায়, নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের নিমিত্তে কিভাবে মাস্তান টাইপের ছেলেদের মদত দেওয়া হয় তা এ গল্পে দেখানো হয়েছে। ঢাকার সামাজিক অবস্থার মধ্যে তেমন কোনো শৃঙ্খলিত রূপ এই গল্পে পরিলক্ষিত হয়নি। শুধু তাই নয় এর পাশাপাশি সমাজের সাধারণ মানুষের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা, বিচারহীনতার সংস্কৃতি, আইন ও প্রশাসনের দুর্বলতা ও একপাক্ষীকনীতি বিশিষ্ট মানসিকতা এই গল্পে এসেছে। এই গল্পের মধ্যদিয়ে গল্পকার শুধু পুরাতন ঢাকার স্থানিক পটভূমি ব্যবহার করেছেন। বাবুল মিয়া ও হাজেরা দম্পতির (দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত) এতিম সন্তান মোহাম্মদ সেলিম। আবদুল আজিজ মিয়ার

(কাঠের ব্যাপারী) একমাত্র কন্যা রূপবতী বিধবা শিরীন আকতারের (২২) সঙ্গে তার (১৬) প্রণয় সম্পর্ক। মূলত শিরীন আকতারের স্বামী মারা যাওয়ার পরে তাকে পিত্রালয়ে আশ্রয় নিতে হয়। আশ্রয়ের অল্পদিনের মধ্যেই সমাজের কিছু মানুষের আধিপত্যবাদী ও অবক্ষয়িত মানসকিতা। নারী লোলুপতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বিপত্নীক এরশাদ সাহেব, জব্বার মাওলানা, তিন ভাই আবু, হাবু ও শফি সকলেই শিরীনকে পেতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের পাঠানো উপহারে শিরিন আকতার প্রলুব্ধ হয়নি। বরং প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছে। কিন্তু এই আধিপত্যকামী ব্যক্তিরা জোর করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে শিরিন আকতারকে ইমারত হোসেনের পুত্র আবু হোসেনের সঙ্গে তাকে বিয়ে দেয়। যদিও শিরীন কবুল বলে না, কিন্তু উপস্থিত সকলেই তার 'না' বলাকে 'হ্যাঁ' মনে করে। যেমন:

> ইমারত হোসেনের পুত্র আবু হোসেনের সঙ্গে সে তার বিয়ের প্রস্তাব কবুল করে কিনা, তখন সেখানে উপস্থিত সকলে স্পষ্ট ও উঁচু করে উচ্চারিত শিরীনের [না] শুনতে পায়। তিনবার শিরীন আকতার [না] বলে এবং তিনবারই ঘরের লোকেরা বলে ওঠে, কবুল করছে এবং তারপর বলে, বিয়া হুয়া গেল, অখন আমরা যাই। মহল্লার লোকেরা চলে যাওয়ার পর তিন ভাই আবদুল আজিজ ব্যাপারীকে সেই রুম থেকে বের করে দেয় এবং তখন, মহল্লার লোকেরা বলে যে, তারা শেষ ভুলটি করে। মোহাম্মদ সেলিমকে আটকে রেখে বিয়ের অনুষ্ঠান দেখানোর পর, ঘর খালি হলে মেজো ভাই হারু শাটের কলার ধরে তাকে টেনে ওঠায় এবং, মান্দার পোলা, এইটা তোর মা লাগে, যা সালাম কর, বলে ধাক্কা দিয়ে শিরীন আকতারের সামনে ফেলে দেয়। (শহীদুল, ২০১৯: ১০৩)

আবু, হাবু, শফি ও উপস্থিত সমাজের উচ্চশ্রেণির কর্তাব্যক্তিরা আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে একজন নারীর ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ও অধিকার হরণ করেছে। অন্যায়ভাবে নিরপরাধ সেলিমকে মানসিক নির্যাতন ও তার আবেগের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে। কর্তাব্যক্তিদের মদদে সেলিমকে সামাজিকভাবে হেয় করেছে এবং তারপর অবশেষে পরের দিন সকালে তারা তাকে হত্যা করে মৃতদেহ ঝুলিয়ে রেখেছে। তারপর এ ঘটনার পুলিশি তদন্তেও সমাজের মানুষের নিষ্ক্রিয়, নিশ্চুপ ভূমিকা, আইন ও প্রশাসনের একপক্ষ নীতিবিশিষ্ট মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। যেখানে মোহাম্মদ সেলিমের বৃদ্ধা দাদির আর্তনাদ, অভিযোগ ও অভিসম্পাত অপেক্ষা সমাজের উচ্চশ্রেণির নিকট তিন ভাই ভালো বলে প্রতীয়মান হয়েছে। সমাজের কতিপয় উচ্চশ্রেণির মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য, আবু হাবু-শফির মতো এক শ্রেণির মাস্তান গড়ে তুলে আধিপত্য বিস্তার করেছে। অসহায় অধীন শ্রেণিকে তাদের অন্যায় শোষণ, অত্যাচার ও অমানবিক আচরণ মেনে নিতে হয়েছে।

৬

ক্ষমতা কাঠামোর পালাবদল সমাজের প্রান্তবাসীর জীবনে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। 'আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল কেন নেই' (১৯৯১) গল্পে ক্ষমতা কাঠামোর নেতিবাচক প্রভাব লেখকের মনে অন্তর্নিহিত চাপা ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। ব্যক্তিজীবনের

নিগূঢ় অভিজ্ঞতার আলোকে গল্পের আঙ্গিককৌশলে তিনি একটা রহস্যাবৃত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। শহীদুল জহির একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। নিজে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, রাষ্ট্রের সামগ্রিক অবস্থা অনুধাবন করে এই গল্পের মধ্য দিয়ে প্রতীকের আশ্রয়ে গল্পকার অন্যরকম একটি বার্তা পাঠককে দিয়েছেন। এ গল্পে ৯০-এর দশকের স্বৈরাচারী শাসন ক্ষমতার নেতিবাচক দিক উঠে এসেছে।

এ গল্পে আধিপত্যকামী শ্রেণির শোষণে ব্যক্তির অসহায়ত্ব প্রকট হয়েছে। এ গল্পে সরাসরি সমাজের নিম্নবর্গের কথা আসেনি, তবে পরোক্ষভাবে যে সরকারি চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত কেরানি শ্রেণির জীবনের কথা বলা হয়েছে, সেখানে রয়েছে নবগঠিত স্বৈরাচারী শাসনে ওই মধ্যবিত্ত স্তরের সীমাহীন হাহাকার ও অস্তিত্বের টানাপড়েনের চিত্র। এ গল্পে ধ্বনিত হয়েছে শোষিত শ্রেণির নীরব প্রতিবাদও। ঢাকার আগারগাঁও কলোনিকে কেন্দ্র করে আবদুস সাত্তার ও তাঁর স্ত্রীর (শিরীন বানু) দাম্পত্য জীবনের মধ্য দিয়ে গল্পকার প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন। আবদুস সাত্তার সরকারি চাকুরে (কেরানি), তার আর্থিক দুরবস্থা নেই। কিন্তু তার চিত্তে রয়েছে মুক্তির প্রত্যাশা। স্বৈরাচারী সরকারের শাসন ক্ষমতা দখলের পরে সরকারি চাকরিজীবীরা যে কত অসহায় ছিল, আবদুস সাত্তারের চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই তা স্পষ্ট হবে। এখানে নয়নতারা ফুল, প্রজাপতির আগমন, মানুষের নয়নতারার প্রতি আগ্রহের জন্য কলোনিতে ভিড় করা, অবশেষে ভূমিকম্প, আবদুস সাত্তারের সিঁড়ির রেলিং বেয়ে নামতে গিয়ে নয়নতারা ফুলকে বাঁচাতে গিয়ে মারা যাওয়া, পরবর্তীকালে নয়নতারা ফুলের বারবার মরে যাওয়া, কৃষিবিদ অধ্যাপকের এক মাসের গবেষণা ইত্যাদি প্রসঙ্গ গল্পকার শহীদুল জহিরের একটা বিশেষ কৌশলমাত্র। আর এ কৌশলকে চরিতার্থ করার জন্য আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব 'মাজিক রিয়ালিজম' বা জাদুবাস্তবতার আশ্রয় নিয়েছেন। যদিও এই কৌশলের মধ্যদিয়ে প্রতীকী আশ্রয়ের মাধ্যমে ৯০-এর দশকের স্বৈরাচারী শাসকের নিকট এক শ্রেণির মানুষের অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। 'নিম্নবর্গ' তত্ত্বেও ব্যক্তির এমন অসহায়ত্ব প্রকাশ পায়। গল্পের প্রতীকী তাৎপর্য হল:

> তবে এও হতে পারে কোনো প্রতীক, যদিও এ ধরনের প্রতীকের ব্যবহার সীমিত হওয়াই ভালো। এ গল্পে একটি জায়গায় বলা হয়েছে তাহলে কি গাছগুলো মস্তিষ্কেও কোনো উপাদান খওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে? শহীদুল জহিরের এ জাতীয় গল্প... পাঠকের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিমূলক।... গল্পে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এ জাতীয় রূপকের অযৌক্তিক মায়াজাল গল্পের সুরকে নষ্ট করেছে... (শহীদুল, ২০১০: ৪৩৮)

আবদুস সাত্তার সরকারি কেরানি হওয়ায় দিনের বেশিরভাগ সময় অফিস থেকে ফেরার পরে বিশ্রামের জন্য বাসার ব্যালকনি ব্যবহার করে। স্ত্রী (শিরীন বানু), দুই পুত্র ও এক কন্যা কারো সাথে তার গভীর আবেগের সম্পর্ক দেখা যায় না। একটা বিছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা তার মধ্যে দেখা যায়। এখানে হয়তো সে মনে মনে এমন পরিবেশে ভেতরে ভেতরে ভেঙে যায়। এখানে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় যে, এই আবদুস সাত্তার যেন একজন আবদুস সাত্তার নয়, সে যেন সকল মুক্তিপ্রত্যাশী মানুষের প্রতিনিধি। জীবিত থাকাকালে কোনোদিন তাকে স্বপ্রণোদিত হয়ে নয়নতারা গাছের পরিচর্যা করার কোনো প্রমাণ

মেলেনি। তবে আশ্চর্য হলেও সত্য এই আবদুস সাত্তার ভূমিকম্পের সময় নিজে বাঁচার চেয়ে রেলিংয়ের নয়নতারা ফুলগুলোকে বাঁচানোর প্রয়াস দেখিয়েছে। এখানে নয়নতারা ফুল যেন স্বৈরাচারী শাসন থেকে মুক্তিপ্রত্যাশী মানুষেরই প্রতীক। এই নব শাসনের মধ্যে হয়তো মানুষ এভাবেই মুক্তির জন্য নিজের জীবনকে মনে করেছে তুচ্ছ। আর ভূমিকম্পে আবদুস সাত্তারের মারা যাবার পর বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়। ভূমিকম্পের পরে অন্য জায়গায় নতুন করে অনেকে নয়নতারা ফুলগাছ আবার লাগায়, কিন্তু কোনো নয়নতারা ফুল বাঁচেনি। তবে যে জায়গায় আবদুস সাত্তারের মাথার মগজ পড়ে, সেই জায়গায় নয়নতারা ফুল বাঁচে। বিষয়টি আরো গভীরভাবে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে অনুধাবনের জন্য কৃষি কলেজের অধ্যাপককে ডাকা হলেও বিষয়টির কোনো সুরাহা হয় না। নয়নতারা ফুল লাগালেও নতুন করে আর বাঁচে না, এর প্রধান কারণ এই স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে এক শ্রেণির মানুষের নীরব প্রতিবাদ। এই গল্পেও সেই অসহায় ব্যক্তিহৃদয়ের হাহাকারের পাশাপাশি ওই শ্রেণির মানুষের নীরব প্রতিবাদও দেখা যায়। এখানে আবদুস সাত্তারের অসহায়ত্ব যেন নিম্নবর্গের ব্যক্তির অসহায়ত্বের ছায়া। সমালোচকের মন্তব্যে এ গল্প সম্পর্কে সে ধারণাটি আরো স্পষ্ট হয়। যেমন:

> অর্থাৎ কলোনির অবরুদ্ধ সমাজে সংবেদনশীল মানুষের সকল সম্ভাবনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও জীবনের প্রতি প্রগাঢ় মমত্ববোধ তার চেতনালোকে সংগুপ্ত থেকেই যায়; যা তাকে উদ্বুদ্ধ করে ধরা-বাঁধা শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবস্থাতেও অন্যকে বিপন্নতার করালগ্রাস থেকে উদ্ধারে। তবে এর বাস্তবায়ন যে দুরূহ, তা গল্পের পরিণতি অংশেই নির্দেশিত। গল্পটিতে আকস্মিক ভূমিকম্পে জনজীবনের বিপর্যয় পরোক্ষ অর্থে স্বৈরাচারী অভ্যুত্থানের সংকটকেই ইঙ্গিতপূর্ণ করে তোলে। কলোনিবাসী এর প্রতিষ্ঠাতাদের নির্দেশানুযায়ী পরাধীন অথচ নিরাপদ শৃঙ্খলিত জীবনে বাধ্যগত হলেও নয়নতারা গাছগুলোর স্বেচ্ছামৃত্যু পরোক্ষ অর্থে কলোনিতে অবরুদ্ধ মানুষের সংবেদনশীল মানুষের অন্যের দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে কোনোমতে বেঁচে থাকার সুযোগকে উপেক্ষা ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অনমনীয় অবস্থানেরই প্রতীক। (তাশরিক, ২০২০: ২৩৩)

সমাজের প্রান্তবাসীর অসহায়ত্ব ও তাদের প্রতি অন্যদের অবিচার ও শোষণের চিত্র নিয়ে লেখা 'কাঠুরে ও দাঁড়কাক' (১৯৯২)। এখানে সমাজের প্রান্তবাসীর সামাজিক অবস্থান ও তাদের প্রতি সমাজের অন্য শ্রেণির মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন তা এখানে উঠে এসেছে। গল্পকার আমাদের দেশের সাধারণ নিম্নশ্রেণির জীবনের নানা কথা ও কঠোর বাস্তবতা নিয়ে গল্প লিখেছেন। এ গল্পে সমাজের নিম্নবর্গের একটি আলাদা পরিচয় রয়েছে। সমাজে যারা অন্তেবাসী, যারা জীবিকার প্রয়োজনে নিত্য সংগ্রাম করে, যাদের বসবাস করার বা মাথা গুঁজে থাকার জন্য কোনো জমি জায়গা নেই, এক কথায় যারা নিতান্ত অসহায় এসব মানুষকে কোনো কোনো সমাজ স্বীকৃতি দেয় না। গ্রাম, শহর ও রাজধানীতে তাদের প্রতি মানুষের ব্যবহার হয় অবিচারমূলক। সামজিকভাবে তাদেরকে প্রকৃত মূল্যায়ন করা হয় না। বরং তাদের জীবনে টিকে থাকার সর্বশেষ ইচ্ছাটুকুও নিঃশেষ করে দেওয়ার প্রচেষ্টায় রত থাকে সমাজের এক শ্রেণির মানুষ। সামাজিক মানদণ্ডের বিচারে এই হতদরিদ্র ও অসহায় মানুষকে সমাজের শোষকশ্রেণি, সমাজের আধিপত্যকামী শ্রেণি তাদের টিকে

থাকার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করছে। সমাজের এই দুই শ্রেণির দ্বন্দ্ব; অসহায় দরিদ্র শ্রেণির জীবন সংগ্রামে পরাজয়ের ইতিবৃত্তনির্ভর এটি অসাধারণ একটি গল্প। অর্থ, বিত্ত ও সম্পদের নিকট মানুষ কিভাবে নিজেদের দায়িত্ব ও বিবেককে বিসর্জন দেয়, তার একটি অকাট্য প্রমাণ রয়েছে এ গল্পে। মানুষের লোভ যে কত ভয়ঙ্কর, আর তা কতটা আগ্রাসী রূপ ধারণ করতে পারে, তার প্রমাণ রয়েছে এ গল্পে।

শুধু জেলা শহর সিরাজগঞ্জের বৈকুণ্ঠপুরের মানুষের মধ্যে নয়, রাজধানী ঢাকার দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব অবহেলা ও অত্যাচারে একটি পরিস্থিতি রয়েছে এই গল্পে। এখানে মানুষের লোভ ও সম্পদের জন্য দরিদ্রশ্রেণির প্রতি নির্দয় আচরণের প্রসঙ্গও আছে। তবে গল্পকার এখানে রূপকথার মধ্যদিয়ে সমকালীন সামাজিক বাস্তবতায় সমাজের নিম্নশ্রেণির প্রতি সমাজের আধিপত্যকামী শ্রেণির বিবেকবহির্ভূত, নীতিবর্জিত কর্মকাণ্ড নিয়ে এসেছেন। এখানে পাখির সঙ্গে সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের তুলনামূলক প্রসঙ্গ এসেছে। পাখিকুলের মধ্যে যেমন কাককে তেমন গুরুত্ব দেওয় হয় না, তাদেরকে নিচু ও হেয় মনে করে, ঠিক তেমনিভাবে এ গল্পে কাঠুরে আকালু ও তার স্ত্রী টেপিকেও সমাজের মানুষ হেয় ও নিচু ভেবেছে। কাক পাখিকুলের মধ্যে হেয় হলেও তারা তাদের কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের জন্য যা ক্ষতিকর, সেই ময়লা-আবর্জনা অপসারণের ক্ষেত্রে অধিকতর দায়িত্ব পালন করে। তেমনিভাবে গল্পকার শহীদুল জহির মনে করেন সমাজের অন্তেবাসীরাও তাদের পরিশ্রমের মাধ্যমে সামগ্রিক কল্যাণের জন্য কাজ করে। তাই এখানে কাকের সঙ্গে আকালু ও টেপির প্রসঙ্গ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। ভূমিহীন কাঠুরে আকালু ও টেপি দম্পতি অন্যের জমিতে আশ্রিত। তারা যখন কিছু অর্থ পায় তখন লুণ্ঠনের শিকার হয়। যেমন:

> টেপি বাড়ি ছিল না, আকালু টাকা বের করার পর উকিল সাহেব বান্ডিল গুণে দাঁত বের করে হাসে, তারপর পাঁচটা বান্ডিল নিজে রেখে অন্য পাঁচটা বান্ডিল আকালুকে ফিরিয়ে দেয়। সিগারেট বিক্রেতা লোকটা আকালুর হাত হতে তিনটি বান্ডিল নিয়ে নেয়, তখন আকালুর হাতের অবশিষ্ট দুটো বান্ডিলের দিকে তাকিয়ে উকিল সাহেব বলে, এই টাকা এক বছরের আগে বাইর কইরো না, তোমাক এই বুদ্দি দিলাম; এক বছর পর অল্প অল্প কইরা বাইর কইরো, বেশি টাকা তোমার হাতে দেইখলেই মাইনঘরে সন্দেহ হইব আর তোমাক ধইরা জেলে ঢুকাইব। (শহীদুল, ২০১৯: ৬৭)

শুধু ঠকিয়েই ক্ষান্ত হয় না। গ্রামবাসী তাদের গ্রামছাড়া করার জন্য রাতের গভীরে আকালু ও টেপির বাড়িতে ডাকাতির ব্যবস্থা করে। এমন পরিস্থিতিতে তারা বৈকুণ্ঠপুর থেকে রাজধানী ঢাকায় আসে। বস্তিতে থাকে। সেখানে আকালু চান্দুর সাহায্যে রিকশা চালিয়ে ও টেপি ছুটা কাজের মাধ্যমে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। অবশ্য ঢাকায় আকালু আবারো কোনো অন্যায় না করে বড় ধরনের বিপদে পড়ে। ম্যানিব্যাগ চুরি না করলেও তাকে চোর সাব্যস্ত করা হয়। জ্যোতিষ ভাস্করের কাচের কেসের রত্নরাজি চুরির মিথ্যা অভিযোগে সে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কারাজীবন শেষে যেখানে আশ্রয় পায় সেখানে অর্থলোভী মানুষেরা তাদের ঝুপড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। সুতরাং আকালু ও টেপির মতো সমাজের দরিদ্র

মানুষের জন্য আর কিছুই করার থাকে না।

সুতরাং আকালু ও টেপির প্রতি ক্ষমতাবানদের ও লোভী ব্যক্তিদের অন্যায় জুলুম তাদের অসহায়ত্বকে সীমাহীন করে তোলে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করলে তারা অস্তিত্বহীনতায় ভোগে এবং অসহায় হয়ে প্রচলিত রীতিকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এ গল্পের মধ্যদিয়ে সেই চেতনা দেখানো হয়েছে।

'ইন্দুর-বিলাই খেলা' (২০০০)' গল্পে ক্ষমতা কাঠামো চর্চার বিষয়টি চমৎকারভাবে উঠে এসেছে। 'নিম্নবর্গ' তত্ত্বে যেমন ক্ষমতা চর্চার বিষয়টি প্রধান হয়ে ওঠে, তেমনি এই গল্পে তাত্ত্বিক সেই চেতনা বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষপটে রচিত এ গল্পে নিম্নবর্গের শ্রেণি অবস্থান উঠে এসেছে। গল্পকার ব্যক্তিগত অনুভূতির জায়গা থেকে মুক্তিযুদ্ধকে এনেছেন, কিন্তু কার্যত বিশেষ আঙ্গিককৌশল ব্যবহার করে প্রতীকী অর্থে ক্ষমতা কাঠামোর ব্যবহারকে দেখিয়েছেন ইঁদুর ও বিড়াল প্রতীক ব্যবহার করে। পুরো গল্পটিতে শহীদুল জহিরের মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী, মুক্তিযুদ্ধকালীন ও মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাস্তবতা নিয়ে এসেছেন। এই গল্পে গল্পকারের তিন ধরনের দর্শন ফুটে উঠেছে। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতার অবয়বে নিম্নবর্গের অবস্থান; দ্বিতীয়ত, নারীসত্তার মধ্যে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনা ও তৃতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধ-পরিবর্তী ক্ষমতাবান (মাস্তান) শ্রেণির অবস্থান। এই দর্শন প্রচারে 'বিলাই'-এর প্রতীকে 'শোষক শ্রেণি' এবং 'ইঁদুর'-এর প্রতীকে 'শোষিত শ্রেণি'কে (নিম্নবর্গ) বোঝানো হয়েছে। প্রাণীদের মধ্যে ইঁদুর ও বিড়ালের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় ক্ষমতা চর্চার ব্যাপারটি। যেখানে বিড়াল সর্বদায় ইঁদুরকে আক্রমণ করার জন্য ধাবিত হয়, একটা সময় বিড়াল ইঁদুরকে ধরেও ফেলে। আর বিড়ালের এই ক্ষমতার ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা ইঁদুরকে ভয়ে ভয়ে পালিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু কোনো কোনো পর্যায়ে বিড়ালের নিকটই ইঁদুরকে ধরা দিতে হয়। আধিপত্য বিস্তারের এ কাঠামোতে বিড়াল সবসময় ইঁদুরকে নিজের আয়ত্তে এনে ক্ষমতা চর্চা করে। এই বাস্তব চেতনা 'ইন্দুর-বিলাই খেলা' গল্পে উঠে এসেছে। এই ক্ষমতা কাঠামো একটি চলমান প্রক্রিয়া। যেখানে ক্ষমতা ব্যবহারকারীগণের সময়ের বিবর্তনে পরিবর্তন সাধিত হয়, কিন্তু শোষিতদের অবস্থান সারাজীবনই একই রকম থাকে। এ বিষয়ে শহীদুল জহিরের বক্তব্য:

> এই খেলার শেষ নাই, খেলোয়াড়ের শেষ আছে, খেলোয়াড় খেলা ছেড়ে যায়, কিন্তু খেইল জারি থাকে। উল্লেখ্য যে, বালকদের খেলা ছাড়া অন্যান্য খেলার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন কারণে, যেমন: বুইড়া হয়ে গেলে বা মরে গেলে অথবা খেলতে খেলতে ক্লান্ত বা বিরক্ত হয়ে গেলে কিংবা জীবনে হঠাৎ দরবেশি ভাব দেখা দিলে, কেবল বিলাইরা ইচ্ছা করে খেলা ছেড়ে যেতে পারে, ইন্দুররা পারে না; বিলাই খেলতে চাইলে ইন্দুরকে খেলতে হবে। (শহীদুল, ২০১৩: ২৪৭)

এখানকার বক্তব্যে গল্পকার প্রতীকী আশ্রয়ে ক্ষমতা কাঠামোর মূল দর্শন দেখিয়েছেন। 'ইন্দুর-বিলাই খেলা' গল্পের প্রথম দর্শনে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতার

আলোকে পাক মিলিটারি ও তাদের দোসর রাজাকারগণ বিলাইয়ের ভূমিকায় অবস্থান করেছে এবং নিরীহ বাঙালিদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন, নারীর সম্ভ্রমহানি, ঘরবাড়ি পোড়ানো ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তারা দেশবাসিকে ইঁদুর বিবেচনা করে মুক্তিযুদ্ধকালীন তাদের চরম আতঙ্ক ও ভয়ের মধ্যে রেখেছে। গল্পের দ্বিতীয় অংশে নারীর মধ্যদিয়ে ক্ষমতা চর্চার বিষয়টি দেখানো হয়েছে। যেখানে ঢাকার দক্ষিণ মৈশুন্দির ভূতের গলির ৩২ নম্বর বাড়ির অল্প বয়স্কা পারভিন সুলতানা ও ৩৩ নম্বর বাড়ির দিলুয়ারা বেগমের মধ্যে একটি চম্পাফুলের গাছকে কেন্দ্র করে ক্ষমতা চর্চার বিষয়টি দেখানো হয়েছে দিলুয়ারা বেগম চম্পা ফুলের গাছ লাগিয়ে পাশের বাড়ির পারভিন সুলতানার বাড়িতে ছায়া ফেলে প্রতিনিয়ত ঝগড়ার মাধ্যমে ক্ষমতা চর্চা করেছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন নারীর প্রতিবাদী চেতনাও ফুটে উঠেছে খতিজা বেগমের মধ্যে। বাবা ও ভাইকে বাঁচানোর জন্য মিলিটারি ও রাজকারদের নিকট তার সম্ভ্রমহানি ঘটেছে। গল্পের অন্য অংশে নবগঠিত বাংলাদেশের এক শ্রেণির চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে ক্ষমতা চর্চার বিষয়টি উঠে এসেছে। চাঁদা আদায় করাকে কেন্দ্র করে মো. হুমায়ুন কবির ও মো. জাহাঙ্গীর হোসেন দুই ভাই ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কেরানি আলতাফ আলিকে হত্যা করে। অন্যদিকে নির্বাচনকে করে সাধারণ নিম্নশ্রেণির মানুষের ওপর ক্ষমতা চর্চার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। ফাতেমা জহুরার পরিবার, চন্দ্রকান্ত, সত্যলক্ষ্মী, পূর্ণলক্ষ্মীর পরিবারের ওপর আহমদ জোবায়ের মিলন ও আবুল কালাম আজাদের কর্মীদের দ্বারা হেনস্থা করার মধ্যে নিম্নবর্গের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজ কাঠামোর মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে স্তর বিন্যাসের পার্থক্য বিদ্যমান। তবে এই সমাজ কাঠামোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছে অর্থনৈতিক মানদণ্ড। বিশ্বব্যাপী সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও অসাম্য বিরাজমান। আর এ অসাম্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের সামাজিক বিভাজন। আর এসব বিভাজন রূপ নিয়েছে নানা সুরে ও মাত্রায়। সমাজে এক শ্রেণির মানুষ অর্থ ও ক্ষমতা কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। অন্য মানুষের ওপর কর্তৃত্ব আরোপ করেছে। তারা শোষণ নীতি চালিয়েছে। আর তাদের দ্বারা শোষিত হতে হয়েছে সমাজের অসহায় ব্রাত্য শ্রেণির মানুষকে। জীবনের পথে তারা হয়েছে পরাজিত, মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে অন্যের অধীনতা। তবে সবক্ষেত্রেই যে তারা মেনে নিয়েছে ব্যাপারটি এমন নয়। তারা জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, বিরোধিতা এবং বিপ্লবও করেছে। এমন গভীরতর ভাবনা থেকেই বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে 'নিম্নবর্গ' তত্ত্বের। আর এই আধুনিক তত্ত্বটি দ্বারা সাহিত্য আলোচনার বহু সুযোগ তৈরি হয়েছে। সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ করে কথাসাহিত্যের আলোকে এই তত্ত্বটির অনুসন্ধান আমাদের সমাজের প্রগতির জন্য, রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য ও সুষম সমাজ গঠনের জন্য খুবই জরুরি।

টীকা

১. শহীদুল জহিরের প্রথম গল্পগ্রন্থ *পারাপার* প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালের জুন মাসে মুক্তধারা প্রকাশনী থেকে। ২০১৪ সালে মাওলা ব্রাদার্স থেকে বের হয় এর দ্বিতীয় সংস্করণ। গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো হলো: 'ভালোবাসা' (১৯৭৪); 'তোরাব সেখ' (১৯৭৫); 'পারাপার' (১৯৭৫); 'মাটি ও মানুষের রং' (১৯৭৬) ও 'ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে' (১৯৭৬)।

২. *ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প* ১৯৯৯ সালে শিল্পতরু প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। আটটি গল্প এর অন্তর্ভুক্ত। যথা: 'আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল কেন নেই' (১৯৯১); 'কাঠুরে ও দাঁড়কাক' (১৯৯২); 'ডুমুরখেকো মানুষ' (১৯৯২); 'এই সময়' (১৯৯৩); 'কাঁটা' (১৯৯৫); 'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' (১৯৯৫); 'ধুলোর দিনে ফেরা' (১৯৯৭) ও 'চতুর্থ মাত্রা' (১৯৯৮)।

৩. তৃতীয় গল্পগ্রন্থ *ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প* প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাওলা ব্রাদার্স থেকে। গল্পগুলো হলো: 'কোথায় পাব তারে' (১৯৯৯); 'আমাদের বকুল' (২০০০); 'মহল্লায় বান্দর, আব্দুল হালিমের মা এবং আমরা' (২০০০); 'ইন্দুর-বিলাই খেলা' (২০০২); 'প্রথম বয়ান' (২০০২) ও 'ডলু নদীর হাওয়া' (২০০৩)।

গ্রন্থপঞ্জি

আবদুল মান্নান সৈয়দ, ২০১১। 'শহীদুল জহির: নিরুচ্চারী কথক', *রবীন্দ্রনাথ থেকে শহীদুল জহির*, লেখালেখি, ঢাকা।

লোকমান কবীর, ২০২১। 'শহীদুল জহিরের ছোটগল্পে বিষয়বাস্তবতা' *কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র স্বর: শহীদুল জহির ও অন্যান্য*, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা।

রণজিৎ গুহ, ১৯৮২। 'ভূমিকা', *Subaltern Studies-1*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লি।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৮। 'ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস', গৌতম ভদ্র সম্পাদিত *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, প্রতিভাস, কলকাতা।

রণজিৎ গুহ, ২০১২। 'ভারতে গ্রামসি: গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি', ফকরুল চৌধুরী সম্পাদিত *গ্রামসি পরিচয় ও তৎপরতা*, সংবেদ, ঢাকা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৯। 'ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস', গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

শহীদুল জহির, ২০১৯। মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সংগৃহীত ও সম্পাদিত *শহীদুল জহির গল্পসমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, বাংলাদেশ।

মিল্টন বিশ্বাস, ২০০৯। 'অস্তিত্ববোধের প্রকাশবৈচিত্র্য: প্রতিবাদ-প্রতিরোধ', *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শহীদুল জহির, ২০১০। মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সংগৃহীত ও সম্পাদিত *শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

তাশরিক-ই-হাবিব, ২০২০। *গল্পকার শহীদুল জহির,* পরানকথা, ঢাকা।

শহীদুল জহির, ২০১৩। মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সংগৃহীত ও সম্পাদিত *শহীদুল জহির সমগ্র,* পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

Antonio Gramsci, 1971. *Selections from the Prison Notebooks,* 'On Italian History Classics in Politics: History of the Subaltern Classes: Methodological Criteria' edited and translated by Quentin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, ElecBook London 1999. (Transcribed from the edition published by Lawrence & Wishart, London.)

Antonio Gramsci, 1971. *Selections from the Prison Notebooks*, edited and translated by Quentin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, Lawrence & Wishart, London,

Simon During, 1992. *Foucault And Literature Towards a Genealogy of Writing*, (Routledge) London and New York.